# সূচীপত্র

الحمد لله رب العا لمين
والصلو ة والسلا م علي سيد ا لمر سلين

## তাবলীগ কি ও কেন?

كنتم خير امة اخر جت للنا س تا مر ون با لمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله

অর্থ: "হে (উম্মতে মুহাম্মাদী) মুমিনগণ! 'তোমরা অন্যান্য সকল উম্মত থেকে উৎকৃষ্ট- এমন এক জামা'আত, যে জামা'আতকে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। (তোমাদের কল্যাণ সাধনের পদ্ধতি এই হবে যে,) তোমরা নেক কাজের হুকুম করতে থাকবে এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বাধা প্রদান করতে থাকবে। আর (এভাবে) তোমরা নিজেদের ঈমান মজবুত করতে প্রয়াসী হবে।' (সূরাহ আল-ইমরান-১১০)

## উম্মতে মুহাম্মদী "সর্বোত্তম উম্মত" কেন ?

কুরআনে কারীমের উল্লেখিত আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীর সকল মুমিন–মুসলমানকে খাইরুল উমাম তথা "সর্বোত্তম উম্মত" ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বোত্তম জাতি। কারণ, তোমাদেরকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ন্যায় জগৎবাসীর কল্যাণের নিমিত্তে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : "তোমরা বড় বড় সত্তরটি উম্মতের পূর্ণতাকারী এবং তোমরা ঐ সমস্ত উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বেশী উত্তম ও বেশী সম্মানী।" (তিরমিযী, হাঃ নং – ৩০০৮, ইবনে মাজাহ, হাঃ নং– ৪২৮৮ )

আয়াতের এ অংশ দ্বারা দু'টি কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়: **১.** উম্মতে মুহাম্মদী সর্বোত্তম উম্মত।, **২.** তাঁদের সর্বোত্তম হওয়ার কারণ হল: তাঁরা বিশ্ববাসীর কল্যাণের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছে । (যেরুপ দায়িত্ব নিয়ে আম্বিয়া (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন) খাতামুন নাবিয়্যীন (শেষ নবী) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম– এর উম্মত সেই দায়িত্বের বদৌলতে 'খাইরুল উমাম' বা সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন । নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত এ নেক কাজগুলো পূর্বের উম্মতগণ

করেছেন, উম্মতে মুহাম্মদীও করছেন । কিন্তু এগুলো তাঁদের খাইরুল উমাম হওয়ার কারণ নয়, এমনকি নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধের দায়িত্বও পূর্বের উম্মতগণ পালন করেছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মদীর উপর যত গুরুত্ব সহকারে অর্পিত হয়েছে, ততটা গুরুত্ব সহকারে অন্য কোন উম্মতের উপর অর্পিত হয়নি । (মা'রিফুল কুরআন, ২ : ১৫০)
এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর প্রত্যেক নর-নারীর উপর তার অধীনস্থ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব । আর এ গুরু দায়িত্বই উম্মতে মুহাম্মদীকে "সর্বোত্তম উম্মত" হওয়ার মহান ফজীলতের অধিকারী করেছে । (মা'রিফুল কুরআন, ২ : ১৩৭)
এ উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি এই দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে, তবে সে যদিও নামায, রোযা সহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী সঠিকভাবে আদায় করেও, তথাপি সে কখনও খাইরুল উমাম বা সর্বোত্তম উম্মতের সম্মানে ভুষিত হবে না । এ দ্বায়িত্ব পালনে যেমনি ভাবে নিজের অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কাজ করতে হবে, তেমনিভাবে এ কাজ নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরাও অপরিহার্য । এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেন : "তোমাদের বিশ্ববাসীর কল্যাণের নিমিত্তে

প্রেরণ করা হয়েছে” আল্লাহ তা‘আলার এ কথার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এক স্থানে বসে তোমাদের এ দ্বায়িত্ব পুর্ণভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হবে না । মানুষের কল্যাণের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ফিরতে হবে । আর তখনই তোমরা খাইরুল উমাম বা সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে ।” (মালফুজাত, ৫২ )

## বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের প্রকৃত পন্থা কি ?

উল্লেখিত আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, “তোমরা বিশ্ববাসীকে সৎ কাজের আদেশ করতে থাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে থাকবে।” এটাই বিশ্ববাসীর জন্য প্রকৃত কল্যাণ সাধন । কারণ, এর মধ্যেই রয়েছে প্রত্যেকটি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের আসল কল্যাণ বা কামিয়াবী ।
প্রকৃত শান্তি আর সব ধরণের সফলতার পর্যায়ে সাধারণভাবে লোকেরা ‘দুঃখীজনকে অন্ন-বস্ত্র দান করাকে তার প্রতি কল্যাণ করা’ মনে করে থাকে । বাস্তবে এটাও

একটা কল্যাণ কামনা বটে, কিন্তু এটা নিতান্তই সাময়িক এবং অস্থায়ী কল্যাণ দান । প্রকৃত কল্যাণ সাধনা হল, খালক্ কে খালিকের সাথে (সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে) জুড়ে দেয়া । অর্থাৎ মানব জাতিকে তাঁর প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কিত করে তাদেরকে স্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে মহা নি'আমতের অধিবাসী বানানো । (সুরা আল ইমরান, ১৮৫)

একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কোন কল্যাণ কামনা আর হতে পারে না । এ সম্পর্কে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেছেন : হাদীস শরীফে আছে, যে অন্যের উপর রহম করে না, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহম করা হয় না । কাজেই তোমরা জমীন বাসীর উপর রহম কর আসমান ওয়ালা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহম করবেন । কিন্তু আফসুস, লোকেরা এ হাদীসের মর্ম শুধুমাত্র ভুকা-নাঙ্গা লোকদেরকে অন্ন-বস্ত্র দানের ব্যাপারে সীমিত করে দিয়েছে । ভুকা-নাঙ্গা ব্যক্তিদের দানের ব্যাপারে তাদের অন্তরে দয়া আসে কিন্তু দীন থেকে বঞ্চিত পথহারা ব্যক্তিদের ব্যাপারে তাদের অন্তরে দয়া আসে না । বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, দুনিয়ার ক্ষতিকে ক্ষতি মনে করা হয় ; কিন্তু দীনের ক্ষতিকে তেমন ক্ষতি মনে করা হয় না । তাহলে আসমান ওয়ালা (মহান আল্লাহ) আমাদের উপর কেন মেহেরবানী করবেন । (মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) ৪৮)

## “সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ” এ কথার তাৎপর্য কী?

সৎ কাজসমূহকে পবিত্র কুরআনে “মারুফ” বলা হয়েছে । যার মধ্যে ঐ সমস্ত নেক আমল এবং সৎকাজ শামিল, যা ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে এবং নবীগণ যুগে যুগে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন । আর অসৎ কাজসমূহকে পবিত্র কুরআনে “মুনকার” বলা হয়েছে । যার মধ্যে ঐ সমস্ত অপকর্ম ও অন্যায় আচরণ শামিল, যা ইসলাম নিষেধ করেছে । (মা‘আরিফুল কুরআন, ২ : ১৪১)

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, সৎ কাজ এবং অসৎ কাজের জন্য আরবী ভাষায় “আমলে সালেহ” ও “আমলে গাইরে সালেহ” শব্দ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কুরআন পাকে “মারুফ ও মুনকার” শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে । এর কারণ এই যে, “মারুফ” ঐ সকল ভাল কাজকে বলে, যে কাজের বৈধতা সর্বজন স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এবং “মুনকার” ঐ সকল মন্দ কাজকে বলে, যে কাজের অবৈধতা সর্বজন স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ । সুতরাং এ শব্দদ্বয়ের মধ্যে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে বিষয়ের দাওয়াত বা হুকুম দেয়া হবে, তার বৈধতা সকলের নিকট পরিচিত হবে । অর্থাৎ সকলেই সেটাকে ভাল বলে জানে এমন হতে হবে । আর যে কাজ থেকে নিষেধ করা

হবে  সে কাজটাও এমন হতে হবে যার, নিষিদ্ধ হওয়া সকলের নিকট প্রসিদ্ধ । অর্থাৎ  নিষিদ্ধ কাজটিও যেন সাধারণ লোকদের নিকট নিষিদ্ধ  বলে পরিচিত থাকে । উদাহরণতঃ ঈমানের দা'ওয়াত ঈমান পূর্ণ করার দা'ওয়াত , নামায , রোযা, হজ্জ, যাকাত  পিতা-মাতার খিদমত, সত্য কথা বলা, পরোপকার করা ইত্যাদি ভাল কাজ হওয়া সম্পর্কে সকলেই জানে । তেমনিভাবে কুফর , শিরক, নামায-রোযা তরক করা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, চুরি-ডাকাতি , হাইজ্যাক, সুদ, ঘুষ, যিনা-ব্যাভিচার , জুলুম-অত্যাচার এগুলোকে  মন্দ কাজ বলে সকলেই জানে । পবিত্র কুরআন মা'রুফ ও মুনকার শব্দদ্বয় বলে উল্লেখিত  বিষয়াবলীর আদেশ ও নিষেধ বুঝানো হয়েছে ।

এর বাইরে যে সমস্ত বিষয় রয়েছে , যেমনঃ যেসব বিষয়ে মাজহাবের ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ ছিল, সেসব বিষয়ে আদেশ নিষেধ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। বরং প্রত্যেকে তার ইমামের মাজহাব অনুযায়ী চলতে থাকবে । এক মাজহাবওয়ালা অন্য মাজহাবওয়ালাকে নিজের মাজহাব মানতে বাধ্য করতে বা হুকুম করতে পারবে না । যেমনঃ  হানাফীগণ ইমামের পিছনে আমীন আস্তে বলেন, শাফি'য়ীগণ আমীন জোরে বলেন। এ ব্যাপারে কোন মাজহাবওয়ালার জন্য অন্যকে

হুকুম দেয়া বা নিষেধ করা জায়িয নয় । কারণ, এ জাতীয় বিষয় মা'রুফ বা মুনকারের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না । কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অনেক স্থানে এগুলো নিয়েই ঝগড়া-বিবাদ হয় । অথচ প্রকৃতপক্ষে যেসব বিষয় মা'রুফ বা মুনকার তা নিয়ে কোন দাও'য়াত বা আলোচনাই হয় না । এটা নিতান্ত নিন্দনীয় কাজ (মা'আরিফুল কুরআন ২:১৪১)

## "সৎকাজে আদেশ" -এর শ্রেণীভেদ

প্রথমেই জানতে হবে যে একজন মুসলমান কি উদ্দেশ্যে অন্যকে দা'ওয়াত দিবে । অন্যের হিদায়াতের জন্য, না নিজের হিদায়াত ও নিজের উন্নতির জন্য । এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল, নিজের হিদায়াত ও উন্নতির জন্যই একে অপরকে দা'ওয়াত দিবে । এতে অন্য ব্যক্তি হিদায়াত প্রাপ্ত হোক বা না-ই হোক, দা'ওয়াত প্রদানকারী অবশ্যই লাভবান হবে । আর এ লাভই দ্বীনী দাওয়াতের মুল লক্ষ্য । প্রত্যেকে নিজের পূর্ণতার লক্ষ্যে আল্লাহর বিধান মত অন্যকে দীনের দা'ওয়াত দিবে এবং সেই ব্যক্তি থেকে তার কোন রকম দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিল করা উদ্দেশ্য থাকবেনা। (মা'আরিফূল কুরআন , ১: ১১৯ মালফুজাত-৫২)

এবার জানা দরকার যে, প্রথমে কিসের দা'ওয়াত দিবে। যেহেতু একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় দৌলত তার ঈমান । ঈমান থেকে বড় কোন দৌলত হতে পারে না। আমলের মর্তবা ঈমানের নীচে । সুতরাং ঈমানের দা'ওয়াতই সর্বপ্রথম দা'ওয়াত । প্রকৃতপক্ষে ঈমান এমন বস্তু, যা শিক্ষা করতে হয় । তার জন্য দীর্ঘ মেহনত ও প্রচেষ্টা চালাতে হয় । সাহাবীগণের মক্কী জিন্দেগীর অধিকাংশ মেহনত ঈমান পরিপক্ক করার লক্ষ্যে ছিল । হযরত উমর ফারুক (রাহঃ) বলতেন : "আমরা প্রথমে ঈমান শিখেছিলাম, তারপর দীনের আহকাম শিখেছিলাম ।" অবশ্য আল্লাহর নগণ্য সংখ্যক বান্দা এমনও রয়েছে যে, ঈমানের কথা শ্রবণের সাথে তাঁদের অন্তরের মধ্যে পরিপক্ক ঈমান বদ্ধমূল হয়ে যায় । তাঁদের জন্য ইয়াক্কীন হাসিলের লক্ষ্যে দীর্ঘ মুজাহাদার কোন প্রয়োজন পড়ে না। তবে আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম যা অধিকাংশ লোকের ব্যাপারে জরুরী, তা হলঃ ঈমান মজবুত করার জন্য ও ইয়াক্কীন পাকাপোক্ত করার জন্য ঈমানের দা'ওয়াতের মাধ্যমে মুজাহাদা করা । (সূরা :আনফ়ূবূত-৬৯) এর ব্যতিরেকে সাধারণ ঈমান হাসিল হয় না । আর মজবুত ঈমান হাসিল না হলে বড় বড় বিপদে (যা তারই উন্নতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে) মানুষ অধৈর্য্য

হয়ে যেতে পারে এবং আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ না–ও করতে পারে অথচ এটা মূমিনের জন্য চরম ব্যর্থতা । মুমিন তো সর্বাবস্হায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হবে । কোন ব্যপারে তার নিজস্ব মতামত থাকবে না । সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করাই তার কর্তব্য । এ জন্য দা'ওয়াতের তারতীব অনুযায়ী অমুসলিমকে সর্ব অবস্হায় প্রথমে ঈমান কবুল করার দাওয়াত দিতে হবে। ঈমান কবুল করার পর তাদেরকে আমলের দা'ওয়াত দিতে হবে। (মিশকাত–১ : ১৫৫) আর মুসলমানদেরকে প্রথমে পরিপক্ক ঈমান হাসিলের দা'ওয়াত দিতে হবে এবং সেই সাথে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার জন্য সহীহ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা, নামায– রোযা ইত্যাদি জরুরী আমল শিক্ষার দা'ওয়াত দিতে হবে । হারাম– মাকরুহ যেমনঃ নামায তরক, রোযা তরক, পিতা–মাতার অবাধ্যতা, সুদ– ঘুষ, মিথ্যা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার দা'ওয়াত দিতে হবে। দা'ওয়াতের মধ্যে ইমামগণের মধ্যে যেসব বিষয় বিতর্কিত, তার আলোচনা করা যাবে না । এই দা'ওয়াত প্রত্যেক মুসলিম নর–নারীর উপর ফরজে আইন । অর্থাৎ প্রত্যেকে তার অধীনস্হ লোকদেরকে বা আত্নীয়–স্বজন, প্রতিবেশী– মহল্লাবাসী ও পরিচিত লোকদেরকে সাধ্যানুসারে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকবে । (সূরা:তাহরীম ৬/বুখারী ১:১২২)

যেখানে হাতের ক্ষমতা চলে সেখানে শক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহর বিধান জারী করবে । আর যেখানে শক্তি প্রয়োগ চলে না, সেখানে মৌখিক নসীহতের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবে । আর যেখানে মৌখিক নসীহত বিপদজনক হতে পারে, বা হিতের বিপরীত বলে প্রবল ধারণা হয়, সেখানে মনে মনে ঐ গর্হিত কাজটাকে (লোকটিকে নয়) ঘৃণা করবে এবং দিলে দিলে ফিকির জারী রাখবে যে, আল্লাহর নাফরমানীর ঐ কাজটা কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে । এ পর্যায়কে ঈমানের সর্বনিম্ন স্থর বলা হয়েছে । (মিশকাত, ৪৩৫) এ পর্যায়ের দীনী দা'ওয়াতের জিম্মাদারী প্রত্যেক মুসলমানের উপর অর্পিত হয়েছে। প্রত্যেকে তার কর্ম পরিসরের মধ্যে এ দায়িত্ব পালন করে যাবে ।

দীনী দা'ওয়াতের দ্বিতীয় স্তর হল–মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি জামা'আত সর্বদা দা'ওয়াতের কাজে ময়দানে থাকবে এবং সকল শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে দা'ওয়াত দিতে থাকবে। এ দা'ওয়াত কোন সময়ই বন্ধ হবে না । এক দল লোক মেহনত করে যখন তাদের দুনিয়াবী জরুরত পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাড়ীতে ফিরবে, তখন অপর দল যারা দুনিয়ার কাজ আঞ্জাম দিয়ে ফেলেছেন ,তারা ময়দানে নেমে যাবে এবং "সৎ কাজের

আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ’’ এর সিলসিলা জারী রাখবে। এ পর্যায়ের দীনী দা`ওয়াত উম্মতে মুহাম্মদীর উপর ফরজে কিফায়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ “হে মুমিনগণ। তোমাদের মধ্যে এমন একটি জামা‘আত থাকতে হবে, যারা সর্বদা লোকদেরকে ভাল ও মঙ্গলের দিকে আহবান করতে থাকবে, যারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকবে। আর তারাই পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করবে। (সূরাহ আল ইমরান -১০৪)

## দীনী দা‘ওয়াতের জন্য কুরবানী

উল্লেখ্য যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) দীনী দা‘ওয়াতের জন্য সর্ববিধ ও সর্বাধিক কুরবানী পেশ করেছেন। মক্কার জিন্দেগীতে দা‘ওয়াতের খাতিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কুরবানী সর্বজনবিদিত, বিশেষ করে তায়েফের লোমহর্ষক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা কোন মুসলমানেরই অজানা থাকার কথা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন “দীনী দা‘ওয়াতের কারণে আমাকে যতটুকু কষ্ট দেয়া হয়েছে, তা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি।” এ দীনী দা‘ওয়াতের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা কিরাম নানাবিধ তাক্লীফ সহ্য করেছেন। হাদীস শরীফে তাঁদের কুরবানীর ব্যাপারে

অসংখ্য বর্ণনা এসেছে । হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফে প্রকাশ্যে দীনের দা'ওয়াত পেশ করলেন তখন কাফিররা চতুর্দিক থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং অন্যান্য মুসলমানদের উপর আক্রমন করলো । হযরত আবু বকরকে (রাঃ) তারা বেদম মারপিট করলো । তাঁকে পদদলিত করলো । উতবা বিন্ রবী'আ কাফির তাকে স্বীয় জুতা দ্বারা মারতে ও পেটাতে লাগল। জুতার আঘাতে তাঁর চেহারা মুবারক যখম হয়ে গেল । হযরত আবু বকরের (রাঃ) পেটের উপর উঠে লাফালাফি করতে লাগল । তিনি এত বেশী পরিমাণ যখম হলেন যে, তার নাক এবং চেহারা চেনা যাচ্ছিল না । তখন তাঁর অবস্হা এমন শোচনীয় হয়েছিল যে, তাঁর বংশধরগণ আশংকা করেছিলেন যে আবু বকর মারা যাবেন । তাই তারা ঘোষণা করেছিলেন যে আবু বকর যদি মারা যায়, তাহলে আমরা অবশ্যই উতবা বিন রবী'আকে হত্যা করে ফেলব । (হায়াতুস সাহাবা, ১ : ২৯৫)

হযরত আবু বকরের ন্যায় অন্যান্য বহু সংখ্যক সাহাবীগণ এই দীনী দা'ওয়াতের জন্য মার খেয়েছেন ,অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন । সীমাহীন কষ্ট বরদাশ্ত করেছেন। এমন কি অনেকে গোত্রের সরদারদের নিকট দা'ওয়াত দিতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন । (বুখারী হাঃ নং-২/৫৮৫)

তাদের সেই দীনী দা'ওয়াতের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতে আজ বিশ্বের আনাচে কানাচে মুসলমানদের পদচারণা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। চীন,আফ্রিকা ও কুসতুনতুনিয়ায় সাহাবায়ে কিরামের সেই গৌরবোজ্জ্বল কুরবানীর স্বাক্ষর এখনও বিদ্যমান রয়েছে । সুদানে এক গ্রাম 'সাহাবা' নামে বিদ্যমান আছে । ঐ গ্রামটিতে ৯ জন সাহাবীর (রাঃ) কবর আছে।

## দীনী দা'ওয়াতের ফায়দা

দীনী দা'ওয়াতের মধ্যে অসংখ্য ফায়দা রয়েছে। শিরোনামের আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একটি জবরদস্ত ফায়দার কথা ঘোষণা করেছেন যে, এ দীনী দা'ওয়াতের মাধ্যমে "তোমরা ঈমানকে পরিপুর্ণ করে নিবে"। এর দ্বারা বুঝা গেল, দীনী দা'ওয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা হচ্ছে–ঈমানের তারাক্কী ও উন্নতি এবং আল্লাহর শক্তি ও কুদরতের উপর অটল ও অবিচল বিশ্বাস অর্জন। বলা বাহুল্য, আজ সারাবিশ্বে সোয়া'শ কোটি মুসলমান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা কাফিরদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ও তাদের তরয তরীকার অন্ধ অনুসারী এবং তাদের দুয়ারের ভিখারী সেজেছে। আজ মুসলমানগণ বিধর্মীদের শিক্ষা, চাল–চলন,

সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কামিয়াবী দেখছে। মুসলমানরা আজ বিধর্মীদের হাতে মার খাচ্ছে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে এসব কিছুর মূল কারণ হচ্ছে–তাদের ঈমানী দুর্বলতা । আজ মুসলমানদের দৃষ্টি খোদায়ী শক্তি থেকে সরে গিয়ে মাখলুকের শক্তির উপর নিবদ্ধ । তাই তারা হয়ে পড়েছে খোদায়ী সাহায্য থেকে বঞ্চিত । (আল–ই‘তিদাল ফী মারাতিবির রিজাল, ৪৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধরনের ঈমানের বলে বলীয়ান করে সাহাবীগণকে রেখে গিয়েছিলেন, যাঁদের মুষ্টিমেয় সংখ্যা সারাবিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, যাঁদের ভয়ে সে যামানার পরাশক্তি রোম ও পারস্য শত শত মাইল দূরে থেকেও কম্পিত ছিল, সেই ধরনের ঈমানী শক্তিওয়ালা মুসলমানদের সংখ্যা এখন পৃথিবীতে খুবই নগন্য। মুসলমান জাতি যতদিন পর্যন্ত এ বাস্তব জিনিসটি অনুধাবন করে তাদের এই ঈমানী দুর্বলতা বিদূরিত করতে সক্ষম না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের অধঃপতন এবং লাঞ্ছনা–গঞ্জনা ভোগ করতেই হবে । কোন তন্ত্র–মন্ত্র, কোন প্রোগ্রাম আর পরিকল্পনা তাদেরকে এ অসহায়ত্ব থেকে উদ্ধার করে বিশ্বের বুকে ইজ্জতের আসনে বসাতে পারবে না । এ সমস্যার একমাত্র সমাধান এই যে, আজ যখন দীন ইসলাম ও আমল সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের

আলোচনা ও প্রচেষ্টা চলছে, তখন সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে তাদেরকে ঈমানী তারাক্কীর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে । এর জন্য সময় বের করতে হবে। আল্লাহর ঘরে এসে দীনী পরিবেশে নিজেকে শামিল করে ঈমানের আলোচনা শুনতে হবে, করতে হবে এবং মানুষের দিলের ময়দানে ঈমানের দা‘ওয়াত নিয়ে ফিরতে হবে । আর তখনই আল্লাহর রহমত শামিলে হাল হয়ে তাদের মজবুত ঈমান নসীব হবে ।

আজ সাধারণভাবে ঈমান শিক্ষার এবং ঈমান পরিপক্ক করার বিষয়টি চরমভাবে অবহেলিত ! এমন কি যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা দীনের উচ্চ কাতারে শামিল রেখেছেন , তাদের অনেকেই এ বিষয়টি-কে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না বা চান না । তারা মনে করেন, আমরা তো মু‘মিন আছিই , এর জন্য আবার মেহনত কেন করতে হবে? কিন্তু তারা যদি এ ময়দানে নেমে কিছুদিন মেহনত করতেন, তখন অবশ্যই তাদের চক্ষু খুলে যেত, বাস্তবিক পক্ষেই তারা ভুলের ভিতরে ছিলেন । ঈমান শিক্ষার মেহনতকে তারা যতটুকু মনে করছেন , বস্তুত্ব তা কেবল ততটুকু নয়, বরং ঈমানের পূর্ণতা হাসিলের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ, কুরবানী এবং এক জবরদস্ত মেহনতের প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেন "উপরে উল্লেখিত আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে' এর অর্থ নতুন করে ঈমান আনয়ন করা নয়। কারণ, এই আয়াতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা মুমিনদেরকে লক্ষ্য করেই দেয়া হয়েছে । কাজেই ঈমান তো তাদের পূর্ব থেকেই আছে । তাই পুনরায় নুতন করে যে ঈমানের কথা বলা হচ্ছে, তার অর্থ ঈমানের পূর্ণতা অর্জন বৈ অন্য কিছু নয় ।" । (মালফুজাত :৫২)

**দীনী দা'ওয়াতের আরেকটি ফায়দা হলো :** এই মেহনত দ্বারা আখিরী যুগের মানুষগণ সাহাবী না হলেও তাদের সাওয়াবের অধিকারী হতে পারেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : " নিশ্চয় এই উম্মতের শেষের দিকে এমন জামা'আত তৈরি হবে,যারা প্রথম যমানার লোকদের ন্যায় সাওয়াবের অধিকারী হবে তারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে । আর তারা ফিতনাকারীদের সাথে (হাত দিয়ে বা যবান দিয়ে কিংবা কলম দিয়ে) মুকাবিলা করবে "। (বাইহাকী শরীফ)

অপরদিকে দা'ওয়াতের কাজ ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে বিভিন্ন রকম ধমকি এসেছে । যেমনঃ বুযুর্গদের দু'আ কবুল না হওয়া, ওহীর

বরকত থেকে মাহরূম হওয়া এবং গুনাহের কারণে ভালমন্দ সকল শ্রেণীর লোকদের আল্লাহর গজবে পতিত হওয়া ইত্যাদি ।
(ফাযায়িলে তাবলীগ , ২৮১)

**দা‘ওয়াতের আরেকটি ফায়দা** সম্পর্কে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) বলেন , দীনী দা‘ওয়াতের মেহনত দ্বারা মানুষদের মধ্যে দীনের তলব ও চাহিদা এবং দীনের ক্বদর ও গুরুত্ব পয়দা হয়। এর দারা মানুষদের ঈমান তাজা হয় । ( মালফুজাত ৭৭)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর উক্ত কথাটি এমন বাস্তব, যা ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনই রাখে না । প্রত্যেক চক্ষুস্মান লোক দেখতে পাবেন যে আজ এই দা‘ওয়াতের মেহনতের কারণে লাখো কোটি অবুঝ, বদদীন,ইংরেজি শিক্ষিত মডার্ণ লোক এমন কি দীনের নাম শুনতে অপ্রস্তুত এমন লোকেরাও দীনের আহকাম সমূহ পূরোপুরিভাবে গ্রহণ করে দীনদারীর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন । তারা পিছনের জিন্দেগীর উপর অনুতপ্ত হয়ে পূর্ণ দীনদারীর উপর চলার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন । নিজের ছেলে মেয়েদেরকে দুনিয়াবী পেটভোজী শিক্ষায় শিক্ষিত না করে আল্লাহ ও তার রাসূলের কালাম শিক্ষার জন্য কওমী মাদ্রাসায় হক্কানী আলেম বানিয়ে দীনের খিদমতের জন্য সর্বোতভাবে

ওয়াকফ করছেন । পাশাপাশি নিজেরাও মহান আল্লাহর নির্দেশ, "তোমরা আমার কালামকে সহীহভাবে তিলাওয়াত কর ।" (সূরা :মুয্যাম্মিল-৪ ) এর নির্দেশ পালন করার লক্ষ্যে আল্লাহর কালাম সহীহ শুদ্ধ করে পড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । কারণ, সীনার মধ্যে সহীহ কুরআন থাকা ফরজ। তা না হলে, নামায সহীহ হবে না । তা ছাড়া এই সহীহ কুরআন তিলাওয়াত হিদায়াতের উপর থাকার জন্য রক্ষাকবচ। (সূরাঃ বনী ইসরাইল, ৯ )

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার সীনার মধ্যে সহীহ কুরআন নেই, তার সেই সীনা বিরান এবং পতিত বাড়ির ন্যায় । ( তিরমিযী,হাঃনং-২৯১৩,দারিমী হাঃনং-৩৩০৬ ) অর্থাৎ পতিত বাড়ি যেমন ইঁদুর, সাপ, বিচ্ছু, শিয়াল, কুকুর আর জিন-ভুতের আড্ডাখানা হয়, তদ্রূপ তার সীনাও খাহিশাত, শয়তান আর নফসে আম্মারার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় । ( আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী যে, তিনি বিজ্ঞান ও কম্পিউটারের যুগে নূরানী পদ্ধতিতে মাত্র ২৫ দিনে ২৫ ঘন্টায় কুরআনে কারীমের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ব্যবস্হা করে দিয়েছেন । )

পাশাপাশি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ "ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর

ফরজ”,(ইবনে মাজা হাঃনং–২২৪, শু‘আবুল ঈমান,হাঃনং–১৬৬৬) এ হ্যদীসের নির্দেশ পালন করতঃ নামায–রোজা, হালাল–হারামসহ দৈনন্দিন জিন্দেগীর জরুরী মাসায়িল জানার জন্য হাক্কানী উলামাগণের সাথে যোগাযোগ রেখে ইলমে দীন শিক্ষার ফরজিয়্যাত আদায় করছেন । এভাবে কুরআন –হাদীসের আহকাম শিখছেন। তৃতীয়তঃ তাদের অনেকে আল্লাহর নির্দেশ, “ঐ সমস্ত মুমিনগণ কামিয়াবী অর্জন করেছে, যারা নিজেদের কলব থেকে খারাপ খাসলত গুলো দূর করে ভাল গুণাবলী হাসিল করতঃ আত্মঅদ্ধি অর্জন করে নিয়েছে । ” ( সূরা : শামস, ৯ ) এ আয়াতের উপর আমল করে কোন হক্কানী বুজুর্গের সোহবতে থেকে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন ।

উল্লেখ্য যে, শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে বটে, কিন্তু চিকিৎসা করা ফরজ করেনি । বরং সুন্নত সাব্যস্ত করেছে । কিন্তু অপরদিকে ক্বলবের রোগ অহংকার, রিয়া, হিংসা, না–শোকরী, বে–সবরী ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরজ । (মা‘আরিফুল কুরআন ১: ৩৩৫ )। এ আধ্যাত্মিক রোগ সমূহ দুর করা এত জরুরী যে, এর ব্যতিরেকে মানুষের সমস্ত জিন্দেগীর আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে তাই তো মেহেরবান আল্লাহ তা‘আলা যমীনের বুকে সকল যমানায়ই তাঁর অনেক বুজুর্গ

বান্দাদের তৈরি করেছেন, যারা মুজাহাদার দ্বারা মানুষদের অন্তর থেকে ঐ সব রোগসমূহ দূরীভূত করিয়ে তার স্হানে নম্রতা, খুলুসিয়্যত, সবর, শোকর ইত্যাদি ভাল গুণ অর্জন করানোর খিদমত আনজাম দিয়ে থাকেন ।

মোদ্দাকথা, দা'ওয়াতের কারণে মানুষের মধ্যে দীনের তলব ও ক্বদর হওয়ার পর তারা ক্বারী সাহেবের নিকট গিয়ে সহীহ কুরআন পড়া শিখে, হক্বানী উলামাগন থেকে মাসায়িল শিখে এবং হাক্বানী পীর থেকে আত্মশুদ্ধি করিয়ে নেয় । আর এভাবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোটা তা'লীম ও প্রোগামকে বাস্তবায়ন করে থাকে ।পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ত্রিমূখী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ) লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান , তাদের আত্মশুদ্ধি করান এবং তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের আহকাম শিক্ষা দেন । " (সুরা : জুমু'আ-২)

সুতরাং যারা দীনের দা'ওয়াতের কাজ আনজাম দিচ্ছেন , তাদের জিম্মাদারী হবে দীনের দা'ওয়াতের সাথে সাথে দীনের অবশিষ্ট বুনিয়াদী জিনিস গুলো হাসিল করার ব্যাপারে তৎপর থাকা। কারণ, যে দীনের দা'ওয়াত তারা দিচেছন, সে দীনের উপর পূর্ণ ভাবে চলাই মুমিনের ফরজ। এজন্যই ছয় নম্বরের ভিতরে বলা হয় যে, এ ছয়টি বিষয়ের উপর আমল করতে পারলে পুরা দীনের

উপর চলা ও আমল করা সহজ হয়ে যায়। তাহলে বুঝা গেল পুরা দীনের উপর চলার ফিকির রাখা জরুরী , আর এজন্যই বলা হয়েছে দীনী দা'ওয়াতের সাথে সাথে প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর কালাম সহীহ শুদ্ধ করে পড়ার ফিকির থাকতে হবে । তেমনিভাবে সকল ব্যাপারে মাসআলা-মাসায়িল জানার জন্য হক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য হাক্কানী বুর্যুগদের সাথে সম্পর্ক রেখে তাদের নিকট নিজের অবস্থা জানাতে থাকা পূর্ণ দীনের উপর চলার জন্য অপরিহার্য। এ গুলো থেকে উদাসীন থেকে পূর্ণ দীনের উপর চলা কখনও সম্ভব নয়।

সত্যিকার অর্থে যখন এ ধরণের ঈমান/আমল ওয়ালা পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক তৈরি হবে, তখনই আল্লাহ তা'লা মুসলমানদেরকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করবেন ।যেমন -কুরআনে শরীফে ওয়াদা করা হয়েছে । ( সূরাহ : নূর, ৫৫ )

পরিশেষে সকল শ্রেণীর মুসলমান ভাইদের খিদমতে আরয, আজ সারা বিশ্বে দা'ওয়াত ও তাবলীগের নামে যে মেহনত চলছে, সেই মেহনতের সাথে যতদূর সম্ভব নিজেকে জুড়ে জামা'আতের সহযোগিতা করতে থাকুন। অবশ্য দ্বীনী দা'ওয়াতের আরো পদ্ধতি আছে, যেমন- হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রঃ) ফাযায়িলে তাবলীগে (পৃষ্ঠা ২১৭) উল্লেখ করেছেন "ওয়াজ নসীহত,

মাদ্রাসার তা‘লীম, মুজাহিদের জিহাদ মুআজ্জিনের আজান এগুলোও দীনের দা‘ওয়াতের মধ্যে শামিল। হযরত থানবী (রহঃ)-এর “দাওয়াতুল হক”, হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপূরী (রহঃ)-এর খাদিমুল ইসলাম জামা‘আত, দরসে নেজামীর সকল মাদ্রাসার তালীম, নূরানী টেনিং, ওয়ায়েজগণের ওয়াজ, রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামের জন্য সহী আন্দোলনকারীদের আন্দোলন-এ সবই দা‘ওয়াতের মেহনতের মধ্যে শামিল। সুতরাং এগুলোকে ছোট করে দেখা যাবে না। প্রচলিত দা‘ওয়াত ও তাবলীগের দীনী কাজগুলোর ও যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সকলের মেহনতই এক এক লাইনের দ্বীনী মেহনত। প্রত্যেকটিই দীনের একেকটি অংশ । সবগুলি মিলেই পূর্ণাঙ্গ দীন এবং সকল মেহনতের সমষ্টিই পরিপূর্ণ দীনী মেহনত। কারণ, কোন একক জা‘মাআত এমন নেই যে, তারা দীনের সকল লাইনের খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। বরং এক এক জামা‘আতকে দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা এক এক লাইনের খিদমত নিচ্ছেন । যেমন একটি বিল্ডিং তৈরিতে এক এক জন এক এক লাইনের মেহনত করছে । কেউ ইঞ্জিনিয়ার,কেউ রড মিস্ত্রী, কেউ রাজমিস্ত্রী কেউ জোগালী ইত্যাদি। সকলের সমন্বিত মেহনতেই বিল্ডিং তৈরি হবে। সুতরাং

সকল প্রকার দীনী জামা’আত দীনের খিদমত করে যাচ্ছেন। তাদের সকলকে সহায়তা ও সমর্থন করা। এভাবে দীনের সকল খাদিমগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সৌহার্দপূর্ণ জোড়, সম্পর্ক ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে । এতে দীনের কাজ পরিপূর্ন গতিশীল ও ব্যাপক হবে । আর এটাই দীনের চাহিদা।

## উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালবাসা

فلعلك باخع نفسك ان لايكو نو ا مو منين

অর্থঃ “যদি তারা এই বিষয়টির প্রতি বিশ্বাস স্হাপন না করে, তবে তাদের পাশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন ।”(সূরাহ কাহ্ফ, আয়াত:৬ ) ।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক কুরআন মজীদ কি জন্য নাযিল করেছেন, তা ব্যক্ত করেছেন । অর্থাৎ কুরআন কাফেরদেকে ভয় প্রদর্শন করবে, যাতে তারা ঈমান গ্রহণ করে এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করবে, যাতে তারা ঈমানের উপর অটল থাকে। তাই কুরআন নাযিলের

উদ্দেশ্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিলেন এবং সকল মানুষের কল্যাণের আশা নিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিতে থাকলেন এবং নিজের সাধ্যানুযায়ী প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু এত চেষ্টার পরও যখন দেখলেন যে, মক্কার মুশরিকরা আরো বেশী বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হয়েছে, নানা রকম অসহনীয় কষ্ট দিতে শুরু করেছে, তখন এতে তিনি খুবই মর্মাহত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন । তাই আল্লাহ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উক্ত আয়াতে অবতীর্ণ করে সান্তনা দিলেন ।

**তাফসীর:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ সরুপ। এজন্যই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উম্মতের কল্যাণ কামনায় কাটিয়ে দিয়েছেন। উম্মতের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং সর্বাধিক ক্ষতির বিষয় হচ্ছে, দুনিয়াতে ঈমানহারা হওয়া এবং এরই পরিণতিতে আখিরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া । এই ক্ষতি থেকে উম্মতকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য তিনি এত বেশী মেহনত করতেন যে, তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন করে দেয়ার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন এবং সর্বাবস্হায় সর্বস্হানে শুধু এ চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন যে, সকল মানুষ কিভাবে ঈমানদার হয়ে

যায় আর এ উদ্দেশ্যে তাঁদের মাঝে ব্যাপকভাবে দা'ওয়াত দিতে থাকতেন ।

তিনি দীনী দা'ওয়াতের সকল প্রকার পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন কখনো পৃথকভাবে দা'ওয়াত দিয়েছেন। আবার কখনো সম্মিলিত মজলিসে দা'ওয়াত পেশ করেছেন। তাঁর পৃথকভাবে দা'ওয়াত পেশ করার নমুনা স্বরূপ হযরত আসমা (রাঃ)-এর হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে (হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পিতা)। বললেন- "আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন-মুক্তি পেয়ে যাবেন।" সুতরাং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। (হায়াতুস্ সাহাবাঃ ১খঃ, ৭৮ পৃঃ)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মিলিত সমাবেশে দীনের দা'ওয়াত পেশ করা সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পর বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে মক্কার মুশরিকদের সমাবেশ হল । তাতে ছিল রাবী'আর দুই পুত্র উতবাহ ও শাইবাহ, আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, উমাইয়া বিন খলফ, আস বিন ওয়ায়েল প্রমুখ । তারা পরামর্শ করছিল যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে ভালভাবে বুঝাবে, যাতে মানুষ একথা বলতে না পারে যে, তোমরা তাকে বুঝাওনি এবং

তাকে এ কাজ থেকে ফিরানোর জন্য কোন চেষ্টা করনি। সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ডাকার জন্য তাদের মধ্য হতে একজন কে পাঠানো হল এবং তাকে বলে দেয়া হল যে, সে তাঁর নিকট গিয়ে বলবে কুরাইশদের সম্মানিত ব্যক্তিগণ জমা হয়েছেন। তারা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষনাৎ সেখানে এ আশা নিয়ে উপস্হিত হলেন যে হয়ত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, হয়ত আমার কথা তাদের দিলের মধ্যে রেখাপাত করেছে। আর তিনি মনে প্রাণে চাইতেন যে, কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করুক এবং কুফরীর কারণে ধ্বংসের সম্মূখীন না হোক। তিনি আসার পর কুরাইশরা তাকেঁ অনেক কথা বুঝাতে চাইল এবং রাজত্ব প্রদানের আশ্বাস দেয়া থেকে আরম্ভ করে মাল-দৌলত, নেতৃত্ব সুন্দরী নারী ইত্যাদির লোভ দেখাল। সব শুনে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যা বলছ এর কিছুই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাকে তো আল্লাহপাক তোমাদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে । তাই আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিলাম । যদি তা গ্রহণ কর, তাহলে দু'জাহানে কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যদি তা

গ্রহন না কর, তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করব। এমনিভাবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।”[হায়তুস্‌ সাহাবা, ১খঃ ৮৩ পৃঃ]
হজ্জের মৌসুমে এবং বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলাসমূহে বিভিন্ন গোত্রের নিকট তিনি দাওয়াত পৌছিয়েছেন। তিনি এক এক গোত্রের তাবুর নিকট গিয়ে বলতেন, তোমরা আমাকে সামান্য সাহায্য কর, যাতে আমি আল্লাহর দীনকে মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারি । তার প্রতিদানে তোমরা জান্নাত পেয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরাই তার কথায় সাড়া দেয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর দা’ওয়াত কবুল করেনি। শুধু এতটূকূই নয়, বরং তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে । নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকের অনেক গাল–মন্দ শুনেছেন । মারপিটও খেয়েছেন । যেমন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দা’ওয়াত দিতে দিতে বনী আমের বিন সা’সাআহ–এর নিকট পৌছঁলেন । তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কষ্ট দিল, যা অন্য কেউ দেয়নি । অর্থাৎ তারা তো ইসলাম গ্রহণ করলই না, বরং রাসূলুল্লাহ যখন চলে যেতে লাগলেন, তখন পিছন থেকে তারা পাথর মারতে শুরু করে দিল । যাতে তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন।[হায়াতূস সাহাবা ১ম খঃ , ৮৭, পৃঃ) ।

বাজারের মধ্যেও তিনি দা'ওয়াত পৌছিয়েছেন। যেমন, হযরত রাবী বিন উবাদ (রাঃ) বলেন- আমি জাহিলিয়্যাতের যমানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুলমাজায বাজারে একথা বলতে শুনেছি যে, "হে লোক সকল! তোমরা বল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কামিয়াব হয়ে যাবে তখন তাঁর চতুর্পাশে বহু লোক ভির করে ছিল এবং তার পিছনে একজন লোক উচ্চ আওয়াজে এ কথা বলছিল যে ,এই লোক বে-দীন হয়ে গেছে এবং সে মিথ্যাবাদী। শুধু তাই নয়,বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিক যেতেন, সেও পিছনে পিছনে সেই দিকেই যেত। আমি মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে ? জওয়াব দেয়া হল যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু লাহাব।" (হায়াতুস সাহাবা ,১খঃ ১০৪ পৃ)

তিনি পায়দল সফর করেও দা'ওয়াতের কাজ করেছেন। যেমন, তায়িফবাসীদের নিকট পায়দল সফর করে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ তো করেইনি, বরং এমন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক। তায়িফের নেতৃস্হানীয় লোকেরা প্রথমতঃ ঠাট্রা-বিদ্রূপ ও গালমন্দ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জর্জরিত করে ফেলল। তারপর দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীর মুবারক ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল। তিনি মাটিতে

লুটিয়ে পড়লেন। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বহু কষ্টে উঠে এলে পুনরায় তাঁকে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করা হলো। তিনি আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । এমনিভাবে হযরত সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় । রক্তের কারণে জুতা পায়ের সাথে কঠিনভাবে আটকে যায়। এত কিছুর পরও রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য কোনরূপ বদ-দু‘আ করেন নি। বরং তাদের হিদায়াতের জন্য দু‘আ করেছেন । আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার প্রস্তাব পেয়েও তিনি তা মঞ্জুর করেননি, বরং তাদের ছেলে-সন্তানদের ইসলাম কবুলের শাবাদ ব্যক্ত করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা ১/২২৮)

সারকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির হিদায়াত ও তাদের উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণ কামনায় বড়ই আকাংখিত ছিলেন । কোন কোন কাফিরকে সত্তর বারের বেশী ইসলামের দা‘ওয়াত দিয়েছেন । আর এ ব্যাপারে তিনি এত বেশী পেরেশান ও অস্হির থাকতেন যে, আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ“তারা যদি ঈমান না আনে, তাহলে তাদের চিন্তায় কি আপনি নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন ?” [সূরাহ কাহ্‌ফ ৬]

মুমিনগণের প্রতিও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় স্নেহশীল ও দয়ালূ ছিলেন। মানব জাতি কোন দুঃখ-কষ্টে লিপ্ত হবে এবং আযাব-গযবে পড়বে-এটা সহ্য করতে পারতেন না। একথার প্রমাণ স্বয়ং কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে সহ্য করা দুঃসহ্। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল,দয়াময়। (সূরাহঃ তাওবাহ-১২৮ )

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের ব্যাপারে এতটুকু স্নেহ-মমতা রাখেন, যতটূকূ মুমিনগণ স্বীয় নফস সম্পর্কে স্নেহ-মমতা রাখে না। অর্থাৎ আমরা নিজেকে যতটুকু মুহাব্বত করি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চেয়ে বেশী আমাদেরকে মুহাব্বত করেন।" [ সূরাহ : আহ্যাব-৬]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহগার উম্মতের প্রতি যে এত মুহব্বত রাখেন, তার প্রমাণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি কাজ কর্ম থেকে প্রকাশ পেয়েছে। আর তিনি দুনিয়াতে উম্মতকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা ফিকির করে শেষ করেছেন এমন নয়, বরং তিনি আখিরাতেও গুনাহগার উম্মাতকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

“প্রত্যেক নবীকেই কবুলের বিশেষ নিশ্চয়তা দিয়ে একটি দু‘আ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সকল নবীগণ (আঃ) দুনিয়াতেই সেই দু‘আটি চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি সেই অধিকার দুনিয়াতে প্রয়োগ করিনি, আখিরাতে আমি আমার গুনাহগার উম্মতের নাজাতের জন্য তা সংরক্ষণ করে রেখেছি ।” [মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৩৩৮৭]

এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে– তিনি সর্বাবস্থায় এ ফিকিরে নিমগ্ন থাকতেন যে , কিভাবে সকল মানুষ ঈমানদার হয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতী হয় ।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন– “একটি পাখি যদি আপন দুই ডানা মেলে আকাশে উড়তো, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে আমাদেরকে একটি নসীহত বা জ্ঞানের কথা বলতেন।” (তাফসীর ইবনে কাছীর, ২খঃ ৪১২ পৃঃ)।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– “আল্লাহ তা‘আলা কতিপয় বস্তুকে হারাম করেছেন অথচ তিনি এটাও অবগত আছেন যে , তোমাদের অনেকেই তাতে লিপ্ত হবে । আর আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে ঐ সব হারাম কাজ থেকে তোমাদের হিফাজত করেছি । অথচ তোমরা পতঙ্গের মত সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হচ্ছো ” (বুখারী, হাঃ নং ৬৪৮৩)।

**অত্র আয়াত থেকে শিক্ষনীয়ঃ**

এ আয়াতে একজন নায়িবে নবী (অর্থাৎ আলেম) ও দাঈ (অর্থাৎ দীনদার ব্যক্তি)-এর দায়িত্ব সুস্পষ্ট রূপে বিধৃত হয়েছ। সারা দুনিয়ার সকলেই কিভাবে দীনের জ্ঞান পেয়ে যায়, সে চিন্তায় যারা দীন সম্পর্কে কিছু বুঝেছে, তাদের সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকা জরুরী। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীনা মুবারক হতে উত্তপ্ত ডেগের ফুটন্ত পানির আওয়াজের মতই করুণ আওয়ায উম্মতের প্রতি সমবেদনায় নির্ঝরিত হত।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ, তেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মদী বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকর। সুতরাং বিশ্ববাসীর নিকট দীন ইসলামের দা'ওয়াত পৌছে দেয়া এ উম্মতের উপর ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ সামান্য সংখ্যক লোক দায়িত্ব আঞ্জাম দিলে, সকলে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারবে না। বরং নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক মানুষের ময়দানে কাজ করতে হবে, যাতে করে বিশ্বের সকলের নিকট দা'ওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়। এটাই ফরযে কিফায়ার অর্থ। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে প্রথমতঃ আমরা ঈমান আমল সহীহ করার ফিকির ও প্রচেষ্টা চালাব তারপর নিজের

পিতা-মাতা,ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঈমান ও 'আমল সহীহ করার জন্য শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী দা'ওয়াত দিব এবং প্রচেষ্টা চালাব ।

এরই পাশাপাশি অমুসলিম ভাইদেরকে শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দিব। তাদের নিকট ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরব এবং সহজ সরলভাবে তুলে ধরব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলে গেছেন " আমি সহজ সরল দীন নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। নিশ্চয়ই দীন অতি সহজ। তোমরা লোকদের নিকট দীনকে সহজ ভাবে পেশ করো। কঠিন ও দুঃসাধ্য করে নয় ।"(ইবনে মাজাহ-৪৩) আর একমাত্র ইসলাম ধর্মই মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে-একথা বুঝাব। এ কাজের জন্য নিজের এলাকা, দেশ ও সারা বিশ্বের অমুসলিমদেরকে আমাদের কাজের কর্মক্ষেত্র মনে করব এবং নিজের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী বিভিন্ন হিকমতের মাধ্যমে তাদের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছাব। আমাদের দ্বারা যদি একজন অমুসলিমও ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সমগ্র দুনিয়া থেকে বড় দৌলত হাসিল হয়ে যাবে এবং এটাই আমাদের নাজাতের সবচেয়ে বড় উসীলা হতে পারে।

## তাবলীগ দম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন–১ : দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ কি ফরজে আইন? দা'ওয়াতের কাজের তারতীব কি ? হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন তারতীবে দা'ওয়াতের কাজ করেছেন? প্রচলিত তাবলীগী জামা'আত যে তারতীবে কাজ করছে, তার বাস্তবতা কতটুকু ?

**উত্তর :** উম্মতে মুহাম্মদীর উপর নামায, রোযা, হজ্ব , যাকাত ইত্যাদি যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে মানুষকে দীনের দিকে দা'ওয়াত দেয়াও ফরজ করা হয়েছে। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী শুধু নিজে নিজে দীনের উপর আমল করলেই তার দায়িত্ব শেষ হবে না। বরং অন্যকেও ঐ সমস্ত আমলে আমলদার বানানোর জন্য আজীবন চেষ্টা করতে হবে ।

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এর গুরুত্বের বর্ণনা রয়েছে। বিশেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্বের সময় অমীয় বাণীতে "তোমরা যারা উপস্থিত আছ, তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট আমার কথা পৌঁছে দিবে।" এর দ্বারা সমস্ত উম্মতে উপর দা'ওয়াতের কাজকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর বাণীর বাহক হয়ে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌঁছে

গিয়ে দা'ওযাতের কাজ করেছেন। তাই আজ লক্ষ্য করলে মক্কা-মদীনায় সাহাবায়ে কিরামের কবর খুব কমই পাওয়া যায়। সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে আনুমানিক দশ হাজার সাহাবীর (রাঃ) কবর মক্কা-মদীনায় পাওয়া যায় আর অন্যদের কবর সুদূর চীন, রাশিয়া, সুদান, আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য স্হানে বিদ্যমান। মোট কথা-নামায ,রোযা ইত্যাদির মত দা'ওয়াতের কাজও ফরজ । উল্লেখ্য যে দা'ওয়াতের কাজ দু'প্রকারে বিভক্তঃ

**১.** নিজের শক্তি ও সামর্থের মধ্যে থেকে নিজের পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাকা । এটা ফরজে আইন ।

**২.** মুসলমানদের পক্ষ থেকে কিছু লোক সব সময় দা'ওয়াতের কাজ করতে থাকা। একদল কাজ করতে থাকবে অন্যদল ঘরের জরুরত পুরা করে নিবে এবং যারা দীনের রাস্তায় বের হয়ে গেছে,তাদের পরিবারের খোঁজ-খবর নিবে। অতঃপর বাড়ীতে অবস্হানকারীরা দা'ওয়াতের কাজে বের হয়ে যাবে এবং ময়দানের গ্রুপ বাড়ীতে ফিরে আসবে। এভাবে মুসলমানগণ জামা'আতভুক্ত হয়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই দীন-ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকবে ।

লোকদেরকে ভাল কাজ করতে বলবে এবং মন্দ কাজ ও জাহান্নামের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে । এ ধরনের পর্যাপ্ত পরিমাণ জামা'আতের সর্বক্ষণ ময়দানে কাজ করা ফরজে কিফায়াহ্ ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে দা'ওয়াতের কাজের জন্য নির্ধারিত বা অবধারিত বিশেষ কোন তারতীব নেই । বরং ইসলাম সমর্থিত যে কোন তারতীবেই দা'ওয়াতের কাজ করা যায় । হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যমানায় দা'ওয়াতের কাজ বিভিন্নভাবে করা হত। কখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় দ্বারে দ্বারে গিয়ে ঈমানের দা'ওয়াত দিতেন। আবার কখনো কাফিরদের কোন মজলিসে গিয়ে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে দীনের দা'ওয়াত পৌঁছাতেন । আবার কখনো সবাইকে একত্রিত করে বেহেশতের সুসংবাদ ও দোযখের ভয় প্রদর্শন করে দীনের উপর চলার জন্য দা'ওয়াত পেশ করতেন । আবার কখনো নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে দা'ওয়াত দিতেন। এমনিভাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) জামা'আত বিভিন্ন এলাকায় বা গোত্রের নিকট বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট পাঠিয়েও দীনের দা'ওয়াত পৌছানোর কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

দ্বীনী দা'ওয়াতের তাগিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন বোধে হিজরতও করেছেন। আবার কখনো চিঠির মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের সরদার ও রাজা-বাদশাহদের নিকট দা'ওয়াত পৌছিয়েছেন অনুরূপভাবে জিহাদের মাধ্যমেও "আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার" এর কাজ করেছেন ।

মোটকথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় দা'ওয়াতের কাজ নির্দিষ্ট এক তারতীবে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং অবস্হার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন তরীকায় দা'ওয়াতের কাজ করা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দা'ওয়াতী জিন্দেগী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে, মাওলানা ইউসুফ (রঃ) রচিত- "হায়াতুস সাহাবা" নামক কিতাব দেখুন। বর্তমান 'তাবলীগী জামা'আত' দ্বারা যেহেতু বিশ্বের আনাচে কানাচে দীনের কাজ চলছে, এর তরজ-তরীকা শরীয়তের কোন বিধানের পরিপন্থীও নয় । বরং তা বিজ্ঞ আলেমগণের কুরআন ও সুন্নাত ভিত্তিতে চিন্তা-ফিকির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত । সুতরাং তাবলীগী জামা'আতের তরয বা তরীকা সম্পূর্ণ সঠিক। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের উমুমী গাশ্ত, খুসূসী গাশ্ত, বিভিন্ন এলাকায় জামা'আত পাঠানো, মসজিদে তা'লীম করা ইত্যাদি এ সবেরই প্রত্যেকটির নমুনা এবং বুনিয়াদ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রামণিত। তবে একটি

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের মেহনত দ্বীনী দা'ওয়াতের জবরদস্ত অংশ বটে । কিন্তু দীনের দা'ওয়াতের কাজ কেবল যে শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এমন নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজা-বাদশাহগণকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে পত্র দিয়েছেন। দা'ওয়াত কবুল না করলে, তাদের সাথে পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদ করেছেন। কিংবা কোন গোত্রের নিকট দীন প্রচার করার পর কবুল না করলে বশ্যতা স্বীকার করতে বলতেন । তা-ও না করলে, জিহাদ ঘোষণা করতেন । তাই দীনী পত্র প্রেরণ, জিহাদ ইত্যাদিও তাবলীগী কাজের গন্ডির ভিতর গণ্য ।

কেউ যদি তাবলীগী জামা'আতের সহিত কোন সম্পর্ক ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াতের কাজ করতে থাকে; সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাকে, তাহলেও তার দা'ওয়াতী দায়িত্ব ও জিম্মাদারী আদায় হবে। তবে জামা'আতের সাথে থাকার ফায়দা ও খাইর-বারাকাত আলাদা । তা হাসিল করতে হলে, হক্কানী জামা'আতের সাথে জুড়ে থাকা কর্তব্য ।

মোদ্দাকথাঃ আসল হচ্ছে দীনের প্রচার ও প্রসারের মেহনত করা । যুগের চাহিদার ভিত্তিতে তার তারতীব বিভিন্ন রকম হতে পারে। বস্তুতঃ পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও মানুষের হালাত ইত্যাদির তাকাজায় আল্লাহপাক স্বয়ং এক এক যুগের

উলামাদের জেহেনে এক এক রকম যুগোপযোগী তারতীব ইলহাম করেন। তাঁরা সেই তারতীবে কাজ করে উম্মতকে দীনের দিকে টেনে আনেন। সেই পদ্ধতিতে আল্লাহ ভোলা অসংখ্য মানুষ আল্লাহর পথে ফিরে আসে। তাই মূল জিনিস হল ঈমান ও আমলের দা'ওয়াত ও মেহনত। তারতীব শুধু কাজের দ্রুত প্রচার ও সুবিধার জন্যে। [প্রমাণ :ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১: ৪১৬-৪৬৫]

**প্রশ্ন ২:** শরীয়তের দৃষ্টিতে "নাহী আনিল মুনকার" অর্থাৎ ! অসৎ কাজে বাধা প্রদান ফরজে কিফায়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । কিন্তু তাবলীগের লোকেরা শুধু সৎ কাজের আদেশ দেয় । কখনও নাহী আনিল মুনকারের ব্যাপারে কিছু বলেন না বা বাতিলের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা জিহাদ কোনটাই শরীক হন না । তাদের এরূপ করা কি ঠিক?

**উত্তরঃ** " তাবলীগের লোকেরা নাহী আনিল মুনকার তথা অসৎ কাজের নিষেধ করেন না " এ কথাটি ঠিক নয় । কারণ, অনেক ক্ষেত্রে সৎ কাজের আদেশের মাধ্যমে অসৎ কাজের নিষেধও হয়ে যায় । যেমনঃ তারা নামায পড়ার জন্য মানুষকে দা'ওয়াত দেন, উৎসাহ প্রদান করেন । যার ফলে বহু লোক নামাযী হয়ে যায় । এখন তাদের এই দা'ওয়াতের মাধ্যমে নামায না পড়া যে "মুনকার" বা অন্যায় কাজ ছিল, হেকমতের সাথে সেই মুনকারের বাঁধা দেয়া হয়ে যায় । কোন

প্রতিবাদ বা সংঘর্ষের প্রয়োজন হয় না । এই পদ্ধতিতে তারা অসংখ্য "নাহী আনিল মুনকার" করে থাকেন । এখন বাকী রইল এমন কতগুলো মুনকার–যা তাবলীগের দ্বারা তৎক্ষনাৎ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা যায় না অথচ সেটারও প্রতিবাদ–প্রতিরোধ মুসলমানদের জন্য ফরজে কিফায়া ।

তবে একথা ঠিক, তাবলীগের মাধ্যমে এই ফরজে কিফায়াটা করা সম্ভব হবে না। কারণ হল, এটা যেহেতু ফরজে কিফায়া, তাই তা সকলের জন্য করা জরুরী নয়। আর শুধু এক তাবলীগ পক্ষ থেকে সব ধরনের কাজ করাও সম্ভব নয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে কোন জামা'আতের পক্ষ থেকে এটা করা যায়। তাতে সকলেই ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। যেমনঃ মুরতাদ সালমান রুশদী, ডঃ আহমদ শরীফ ও তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে মুসলমানরা প্রতিবাদ করেছে এবং করছে।

তাবলীগের মেহনতটা বিশ্বজুড়ে একটা নীরব আন্দোলন। এই আন্দোলন বাস্তবায়িত হলে, সে দিন মুসলমানদের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে । বিভিন্ন হেকমতের কারণে কিছু "নাহী আনিল মুনকার" তাবলীগের নামে করা সত্যই মুশকিল । তাতে ফরজে কিফায়া করতে গিয়ে তাদের অনেক জরুরী কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে । এই মজবুরীর কারণে তাবলীগের নামে এ জাতীয় খিদমত আঞ্জাম

দেয়া যায় না। এ জন্য হযরত শাইখ যাকারিয়া (রহঃ) তাবলীগী জিম্মাদারদেরকে বলেতেন, তারা যেন সমাজের মুনকারাতের (অন্যায়-অপকর্মের) ব্যাপারে মাথা না ঘামান। বরং তারা যে কাজ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, সেই কাজ নিয়েই যেন চলতে থাকেন । অতঃপর তিনি হযরত থানবী (রহঃ)-এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন যে. হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন : (বিশ্বব্যাপী কাজের স্বার্থে) তারা যখন মুনকারাতের ব্যাপারে প্রতিবাদ না করার উসূল বানিয়েছেন, তো তাদের সেই উসূলের উপর থাকা উচিৎ। (মালফুজাতে শাইখ (রহঃ)- ২৮)

বাস্তবিকপক্ষে অনেক সময় এমন ঘটে যে, অনেক কাজ এক সাথে করতে গেলে কোনটাই সুন্দরভাবে সম্ভব হয় না। বরং সবটাই অসুন্দর হয়ে যায় , বা সম্পূর্ণটা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । এর কারণে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ সাবজেক্টের ভিত্তিতে বড় বড় মাদ্রাসা কলেজ ভার্সিটিগুলোকে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবগুলো সাবজেক্ট রাখা হয় না । (এটা শুধু উদহারণ স্বরূপ বলা হল ।)

**প্রশ্ন-৩:** তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা মসজিদে থাকে, খায়, ঘুমায় । শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়িয কিনা ?

**উত্তরঃ** ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় বুখারী শরীফে মসজিদে শয়ন সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। সেখানে তিনি অস্থায়ীভাবে মসজিদে থাকা জায়িয প্রমাণিত করেছেন। **পৃষ্ঠা-৪৭**

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) যুবক বয়সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদে শয়ন করতেন। তখন তার স্ত্রী ছিল না অর্থাৎ তিনি তখন অবিবাহিত ছিলেন। (বুখারী শরীফ, ১:৬৩)। হযরত সাহল বিন সা‘আদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হযরত আলীর (রাঃ) কথা জিজ্ঞাসা করেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেনঃ তিনি কোন কারণে নারাজ হয়ে কোথাও চলে গেছেন। এ কথা শুনে তাকে তালাশ করার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক পাঠালেন। তালাশ করার পর লোকটি এসে বলল: তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে রয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে গমন করলেন দেখলেন! হযরত আলী (রাঃ) নিদ্রায় বিমগ্ন এবং তাঁর গায়ের চাদর সরে গিয়ে তাঁর গায়ে ধুলোবালি লেগে গিয়েছে। তাঁকে জাগ্রত করতে গিয়ে নবী করাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ওহে আবু তুরাব (মাটি মাথা) উঠো।” (বুখারী শরীফ, ১:৬৩৩) এমনিভাবে এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বিদ্যমান আছে।

এছাড়া তাবলীগ জামা‘আতের লোকেরা অনেকে মুসাফির থাকে, তাছাড়া তারা মসজিদে প্রবেশ করেই ইতিকাফের নিয়্যত করে থাকেন । আর মুসাফিরের জন্য বা ইতিকাফের নিয়্যত করার পরে মসজিদে থাকা, থাওয়া ও শোয়াতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই।

তদুপরি সর্বত্র দীনের প্রচার-প্রসারে ও দা'ওয়াতের মহান জিম্মাদারী আদায়ের জন্য মসজিদই উপযুক্ত স্থান। তাবলীগের জন্য এর বিকল্প নেই। তবে কোন মসজিদ কর্তৃপক্ষ যদি তাবলীগ জামা'আতের লোকদের জন্য মসজিদ-এর আশে পাশে মসজিদ আবাদ করারই অঙ্গ সরূপ ভিন্ন কামরা নির্মাণ করে দেন; তা খুবই উত্তম।

অজ্ঞতা প্রসূত অনর্থক অজুহাত খাঁড়া করে তাবলীগী জামা'আতকে নিন্দা বা অপদস্ত করা মারাত্মক অপরাধ। কারণ দীন শিক্ষা করা বা দীনের পূর্ণতা অর্জনের লক্ষে নিজের খরচে নিঃস্বার্থভাবে দীনের দাওয়াতের ইখলাসপূর্ণ মেহনতে–তাবলীগী জামা'আত একটি হক্কানী সহীহ জামা'আত। এ ব্যাপারে সমগ্র পৃথিবীর উলামাগণ একমত। এর কার্যক্রম ও ব্যবস্হাপনা হক্কানী উলামা-মাশায়িখের পরামর্শ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। বর্তমান যামানায় সাধারণ লোকদের দীন ও ঈমান শিক্ষার জন্য তাবলীগী জামা'আতের মেহনত খুবই মুবারক ও উপকারী। এ মেহনতের উসীলায় বহু পথভোলা মানুষ সহীহ পথের সন্ধান পেয়ে দীনদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং করছেন । তাই দীনের এ মেহনতে অংশ নিতে না পারলেও অন্ততঃ এর সমর্থন ও সম্ভাব্য সহযোগিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের দ্বীনী দায়িত্ব।

**প্রশ্ন-৪ :** তাবলীগ জামা‘আতের লোকেরা বলে থাকেন, “তাবলীগে বের হয়ে ১টি টাকা খরচ করলে, সাত লক্ষ টাকা দান করার সাওয়াব হয় এবং কোন নেক আমল করলে ৪৯ কোটি নেক আমলের সাওয়াব হয়। এক এক কদমে ৭০০ নেকী হয়” এগুলোর কোন প্রমাণ আছে কি না?

**উত্তরঃ** দীনের প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা চালান প্রত্যেক মুসলমানের জিম্মাদারী। বর্তমান যামানায় দীনের প্রচার-প্রসার ও বে-দীনীর প্রতিরোধ তাবলীগের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর হচ্ছে। অন্যদিকে জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হচেছ আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্টা করা। কাফের হত্যা করা, বে-দীনের খতম করা জিহাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং তারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পথে বাধা, তাই বাধা দুর করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদেরকে খতম করা ফরজ করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে জিহাদের যে মূল লক্ষ্য, দা‘ওয়াত ও তাবলীগের সেই একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উক্ত লক্ষের বাস্তবায়নের জন্যই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী দীনের দা’ওয়াত নিয়ে তাবলীগের নামে সমগ্র বিশ্বে ঘোরাফেরা করা হচ্ছে। সে জন্য জিহাদের ব্যাপারে যে সব ফজীলত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো তাবলীগের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবো।

এখানে প্রশ্নে উল্লেখিত সওয়াব গুলো আসলে জিহাদের ফজীলতের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তথাপিও সেগুলো তাবলীগের ব্যাপারে বয়ান করতে কোন অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে হক্কানী উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন। এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি দীনের রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দিল এবং নিজে শরীক হওয়ার সুযোগ পেল না, তাকে প্রতি দিরহামের বিনিময়ের সাত শত দিরহাম দান করার সওয়াব দেয়া হবে।” হাদীসে আরো আছে, “যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় বের হবে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে তার প্রতি দিরহামে সাত লক্ষ দিরহাম খরচ করার সাওয়াব হাসিল হবে।” উক্ত কথার প্রমাণ স্বরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন যার অর্থ: আল্লাহ তা’আলা যার জন্য ইচ্ছা করেন তার (আমলের) সাওয়াবকে বর্ধিত করতে থাকেন। (সূরা বাকারা, ইবনে মাজা : ১৯৮) অন্য এক হাদীসে আছে, দীনের রাস্তায় নামায, রোযা, জিকির অর্থাৎ শারীরিক ইবাদাত দীনের রাস্তায় পয়সা-কড়ি খরচ করা থেকে সাত শত গুণ বেশি সাওয়াবের কাজ। (আবু দাউদ শরীফ, ৩৩৮)।

সে হিসেবে পয়সা-কড়ি খরচ করলে যদি সাত লক্ষ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় তাহলে শারীরিক

ইবাদতগুলোর ক্ষেত্রে তার সাথে আরো সাত শত গুণ বৃদ্ধি করতে হবে তাতে দেখা যায় যে, একবার সুবহানাল্লাহ পড়লে, উনপঞ্চাশ কোটি বার সুবহানাল্লাহ পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে । এমনিভাবে নামায রোযা ইত্যাদির হিসাব হবে।
অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন হযরত উসামা (রাঃ) কে জিহাদের জন্য বিদায় দিতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি পায়ে হেঁটে চলছিলেন এবং উসামা সাওয়ারীর পিঠে চড়ে চলতে ছিলেন । উসামা আরয করলেন, “হে আমীরুল মুমিনীন! হয়তঃ আপনিও আরোহণ করুন, নতুবা আমি নেমে আসব। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) বললেন: খোদার কসম! উসামা তুমি নেমো না। আর আমিও আরোহন করবো না। কিছুক্ষনের জন্য আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি আমার পায়ে লাগলে ক্ষতি কি? অথচ দীনের রাস্তায় চললে প্রতি কদমে সাত শত নেকী হাসিল হয় এবং জান্নাতের পথে সাত শত দরজা বৃদ্ধি পায় এবং তার আমলনামা থেকে সাত শত গুনাহ মুছে ফেলা হয়।
[প্রমাণঃ কানযুল উম্মাল, ৫:৩১৪/ আবু দাউদ শরীফ, ১:৩৩৮/ দূররে মানসুর, ২:২১৫/ ইবনে মাজাহ, ২:১১৮/ খাইরুল ফাতাওয়া ১:৩৭১-৩৭২]

**প্রশ্ন-৫:** তাবলীগী জামা'আতের লোকেরা অনেক সময় বলেন, দীনের দা' ওয়াত দিতে গিয়ে কারো দরজায় কিছু সময় অপেক্ষা করা, কদরের রাত্রে বাইতুল্লায় গিয়ে হাজরে আসওয়াদ সম্মুখে রেখে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম । তাদের এ কথা কি ঠিক?

**উত্তর :** হ্যাঁ একথা হাদীস শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণণা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আলাহর রাস্তায় কিছু সময় খাড়া হওয়া অর্থাৎ দীনের দা'ওয়াত দেওয়া কদরের রাত্রে বাইতুল্লাহ শরীফে হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করার থেকেও উত্তম। এ রিওয়ায়াত বাইহাকী শরীফে ও ইবনে হিব্বান শরীফে বর্ণিত আছে। [প্রমাণঃ কানযুল উম্মাল, ৪ : ২৮৪/ আত-তারগীব, ২ : ৩৪৬ / দুররে মানসুর, ২ : ১১৫]

**প্রশ্ন-৬:** তাবলীগী জামা'আতের ভাইয়েরা বলে থাকেন- যে, দা'ওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রথম কদম ফেলে দ্বিতীয় কদম ফেলবার পূর্বেই তার জীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় । এ কথাটির সত্যতা কতটুকু ?

**উত্তর :** এ কথাটি সরাসরি এভাবে নয়; বরং হাদীস

শরীফে বর্ণিত আছে– “যে ব্যক্তি দীন–ইসলাম তলব করবে, তার পিছনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। ( মিশকাত শরীফ,হাঃনং–২৬৪৮,দারিমী হাঃনং–৫৬১ ) এছাড়াও যখন কোন মুসলমান দীনকে সামনে নিয়ে বের হয়, তখনই তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায় । অতঃপর যখন সে জীবনের কবীরা গুনাহসমূহ থেকে তওবা করে, তখন সকল কবীরা গুনাহসূহ মাফ হয়ে যায় । এভাবে তার জীবনের সকল গুনাহ মাফ হতে পারে ।

**প্রশ্ন–৭ :** তাবলীগ জামা‘আত কি হক ? যদি হক হয়ে থাকে তাহলে কিছু সংখ্যক আলেম এর বিরোধিতা করেন কেন ?

**উত্তর :** নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর চিন্তা ধারা এই ছিল যে, প্রত্যেকটি মানূষেব সম্পর্ক আল্লাহ তা’আলার সাথে হয়ে যাক এবং প্রত্যেকটি লোক জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতবাসী হয়ে যাক। এভাবে সমস্ত দুনিয়াতে আল্লাহর দীন প্রতির্ষ্ঠিত হয়ে যাক । প্রচলিত তাবলীগী জামা’আত (যার মধ্যে সকল হক্কানী উলামায়ে কিরাম শামিল আছেন) যেহেতু এ ফিকির নিয়ে নিজের খরচে মানুষের ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং এটাকে না হক বলা নিজের মুর্খতা জাহির করা ছাড়া আর কিছুই নয় । তবে

নগন্য সংখ্যক আলেম যারা এ বিরোধিতা করেন, তারা সম্ভবতঃ তাবলীগী জামা'আতকে গভীরভাবে দেখার সুযোগ পাননি বা কিছু ইলমবিহীন তাবলীগী ভাইদের আচার-ব্যবহারে বা কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ির কারণে উল্টা বুঝে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করে থাকবেন । তবে উভয়টা তাদেরই দুর্বলতা। কারণ, কোন ব্যাপারে যখন তারা মুখ খুলতে চান, তখন তাদেরই উচিৎ-নিজের পণ্ডিত্যের উপর নির্ভর না করে জিনিসটি ভালভাবে যাচাই করা। প্রয়োজনে নিজের বড় ও প্রবীণগণের স্মরণাপন্ন হয়ে বা উক্ত জামা'আতের সাথে কিছু সময় দিয়ে মেহনতটা বুঝতে চেষ্টা করা। শুধু নিজের পুঁজি দিয়ে সকল ক্ষেত্রে সবকিছু সমাধান দেয়া সম্ভব না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে "তোমাদেরকে যে ইলম ও জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা খুবই নগণ্য। [সূরা বনী ইসরাইল, ৮৫]

দ্বিতীয় ব্যাপারে কথা হচ্ছে-তাবলীগের বে-ইলম সাথীদের সাথে কোন কথা বা কাজকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা আলেমের শান নয়। তিনি তো দেখবেন ঐ সকল বুজুর্গগণের কাজ বা কথাকে যারা এ কাজকে প্রচলিত পদ্ধতিতে চালু করেছেন। তারা কেমন ধরনের বুজুর্গ

ছিলেন। তাদের ইলমের উপর তাদের সমসাময়িক ওলামাগণ নির্ভর করতেন কি না? তারা বিশ্বস্ত ছিলেন কি না? তাদের বয়ান, তাকরীর ও মালফুযাতে কোন আপত্তিকর কথা আছে কি না? এসব দেখে একজন আলেম সিদ্ধান্তে পৌছাবেন। তাবলীগী জামা'আতের কোন আমীর ও জিম্মাদার মূলনীতির খিলাফ করলে, তার ভুলের সমালোচনা না করে বরং তা শুধরিয়ে দিবেন । এটাই উলামায়ে কিরামে দায়িত্ব। কূরআন এ নির্দেশই দেয় যে, "তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা কর।' (সুরাহ মায়িদা–২)

**প্রশ্ন–৮:** অনেক এলাকায় দেখা যায় যে, মহিলারা সাপ্তাহিকভাবে মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাবলীগ করে, তা'লীম করে, কেউ কেউ বলে যে, মহিলাদের এভাবে তাবলীগ করা, তা'লীম করা জায়িয নয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক ফায়সালা জানতে চাই?

**উত্তর :** পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও ইলমে দীন শিক্ষা করা ফরজ। যেমন: হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইলমে দীন অর্জন করা প্রত্যেক নর–নারীর উপর ফরজ । (মিশকাত শরীফ,৩৪) এখন কথা হলো যে– এ ইলম অর্জনের জন্য তা'লীম এবং মু'আল্লিম

তথা শিক্ষক প্রয়োজন । শিক্ষক ও তা'লীম ব্যতীত কখনো প্রকৃত ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা বুখারী শরীফের এক হাদীসে এসেছে, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রকৃত ইলম ঐটা যা তা'লীম এবং শিক্ষকের মাধ্যমে অর্জিত হয়। (বুখারী শরীফ ১ : ১৬)

এমনিভাবে সূরা আর-রাহমানের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা নিজে বান্দাদের জন্য মু'আল্লিম হওয়া ব্যক্ত করেছেন :"করুনণাময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন"। (সূরাহ আর-রাহমান, ১-২)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "আমাকে মু'আল্লিম তথা শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে"। (ইবনে মাজাহ শরীফ, ১ : ২১)

এ হাদীসদ্বয় ও আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দীনী ইলম অর্জনের জন্য তা'লীম ও শিক্ষক জরুরী। এতে পুরুষ-মহিলা উভয় শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আয়াত ও হাদীস শরীফে শুধু পুরুষদের কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি । অতএব, ইলমে দীন অর্জনের জন্য তা'লীম ও শিক্ষক এবং পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেনীর জন্যই আবশ্যক। তাছাড়া ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে

ইসমাঈল স্বীয় লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফে মহিলাদের তা'লীমের ব্যাপারে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করে একথা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও দ্বীনী তা'লীম একান্ত জরুরী।

উক্ত অধ্যায়ে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, "তা হলোঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামায আদায় করতঃ অনুভব করলেন যে, মহিলাগণ বয়ান শুনতে পায়নি, তাই তিনি মহিলাদের মজমার দিকে একটু অগ্রসর হলেন। সাথে হযরত বিলাল (রাঃ) ও ছিলেন। অতঃপর তাদেরকে তথায় নসীহত করে দীন শিক্ষা দিলেন এবং সদকা প্রদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন মহিলাগণ স্বীয় কানের অলংকার, আংটি দান করে দিলেন, আর হযরত বিলাল (রাঃ) সেগুলো কাপড় পেতে গ্রহণ করলেন। (বুখারী শরীফ, ১:২০)

উক্ত আলোচনার দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, মহিলাদের ভিন্নভাবে তা'লীম গ্রহণ শরীয়ত স্বীকৃত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তাদের এরূপ তা'লীম ব্যাপকভাবে হওয়া প্রয়োজন। আর এ তালীম নিজ ঘরে কোন মহিলা বা মাহরাম পুরুষ কর্তৃক হওয়া উচিৎ হলেও অনেক ক্ষেত্রে এমনটি সহজে হয় না বিধায় সাপ্তাহিক

তাবলীগী তা'লীমের ব্যবস্থা হওয়া জায়িয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন ভাবেই যেন পর্দা ও শরীয়তের অন্যান্য হুকুম লংঘন না হয় এবং যিনি তা'লীম দিবেন, তাকে অবশ্যই সহীহ আক্বীদাহ ওয়ালা বিজ্ঞ ব্যক্তি হতে হবে । যেন দীনের তা'লীমের নামে বে-পর্দা তথা শরীয়ত পরিপন্থি বা ঈমান-আক্বিদার ক্ষতির কারণ না হয় ।

বলতে কি, যারা মহিলাদের ভিন্নভাবে দ্বীনী তা'লীমকে নাজায়িজ বলেন এবং "মহিলাদের তা'লীম নেই" এরূপ কথা বলেন, তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে ডুবে আছে। তাই তাদের এহেন কথা থেকে তাওবা করে নেয়া উচিত। [প্রমাণ: সূরাহ আর-রাহমান, আয়াত, ১-২, বুখারী শরীফ ১:১৬,২০, কানযুল উম্মাল ১০ :৩০]

**প্রশ্ন- ৯** : তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা বলে থাকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে এক টাকা খরচ করে, তাকে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করার সওয়াব দেয়া হয়। একটি নেক আমল করলে উনপঞ্চাশ কোটি নেক আমলের সওয়াব দেয়া হয়।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহর রাস্তা বলতে কি শুধু তাবলীগ জামা'আতকেই বুঝানো হয়েছে? নাকি আল্লাহর অন্যান্য

রাস্তা এর অন্তর্ভুক্ত? যেমন- মাদ্রাসা বা খানকা । মাদ্রাসায় পড়াবস্থায় এক টাকা খরচ করলে বা একটি নেক আমল করলে ঐ পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে কি? যদি মাদ্রাসায় পড়লে অনূরুপ সওয়াব না পাওয়া যায়, তাহলে মাদ্রাসায় পড়া উত্তম, না তাবলীগে সময় লাগানো উত্তম?

**উত্তরঃ** হ্যাঁ, আল্লাহর রাস্তায় এক টাকা খরচ করলে সাত লক্ষ টাকা দান করার ছাওয়াব পাওয়া যায় এবং একটি নেক আমল করলে উনপঞ্চাশ কোটিগুণ ছাওয়াব পাওয়া যায় তাও ঠিক। কিন্তু এই ফজীলত শুধু তাবলীগের সাথে খাস মনে করা বা তাবলীগের রাস্তাকে এর একমাত্র রাস্তা মনে করা বড় ধরনের মুর্খতা বা কম ইলমীর পরিচায়ক ।

কারণ, আল্লাহর রাস্তা বলতে কুরআন ও হাদীসে প্রথমত: জিহাদ তথা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আলাহর রাস্তার প্রথম মিসদাক বা উদ্দেশ্য হলো জিহাদের রাস্তা। তবে দীনের স্হায়িত্ব ও প্রসারের আরো যত রাস্তা ও মাধ্যম আছে, যথা-মাদ্রাসা, তাবলীগ, খানকাহ, ওয়াজ-নসীহত, দ্বীনী কিতাব রচনা করা ইত্যাদি-এসবও পরোক্ষভাবে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু মূল উদ্দেশ্য

অর্জনে ক্ষেত্র ভেদে এগুলোও সহায়ক বা সমান কার্যকরী হয়ে থাকে,তাই কুরআন ও হাদীসে যে সকল ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে, রস সকল ফজীলত তাবলীগ ও মাদ্রাসাসহ অন্যান্য দ্বীনী রাস্তায়ও পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় । [প্রমাণ: ইবনে মাজাহ হাঃ নং-২৭৬১/খাইরুল ফাতাওয়া,৩৭১/দূররে মানসূর, ২:১১৫]

**প্রশ্ন - ১০ :** অনেকে তাবলীগ জামা’আতকে তিরস্কারের ছলে কটাক্ষ করে বলে যে, ১০০ বৎসর পূর্বে তাবলীগ ছিল না, ১০০ বৎসর পরে তাবলীগ এসেছে সুতরাং এটা নতুন আবিষ্কার এবং বিদ’আত । তাদের এসব কথার শরয়ী ফয়সালা কি?
**উত্তরঃ** বর্তমান তাবলীগী জামা‘আত দ্বারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে দীনের যথেষ্ট কাজ হচ্ছে। আর এর নিয়ম-নীতিমালা শরীয়তের কোন বিধানের পরিপন্হি নয়। বরং তা বিজ্ঞ আলেমগণের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিতে পরিচালিত। সুতরাং তাবলীগ জামা`আতের নিয়ম নীতি ও তরজ-তরীকা সম্পূর্ণ সঠিক,এটাকে বিদ‘আত বলা মূর্খতা।

উল্লেখ্য যে,প্ রচলিত তাবলীগী জামা‘আতের উমুমী গাশ্ত, খুসুশী গাশ্ত, বিভিন্ন এলাকায় জামা‘আত পাঠানো, মসজিদের তা‘লিম করা ইত্যাদি এসবের প্রত্যেকটির নমুনা-মিছাল স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে

প্রমানিত। সুতরাং যারা তাবলীগ জামা‘আতের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কটাক্ষ করে কথা বলে তারা এ মেহনত সম্পর্কে সহীহ ধারণা রাখে না এবং তারা এ মেহনতকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ পায়নি বলে মনে হয় কোন জিনিষকে ভালভাবে না জেনে মন্তব্য করা ঠিক নয় । ভালকাজ করার তৌফিক না হলেও ক্ষতির কাজ না করা চাই। বিশেষ করে দীনের ক্ষতি করা আরো বেশী মারাত্মক। তারা যদি এসব তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে পরীক্ষামুলক এ মেহনতে শরীক হয়ে কিছু দিন সময় লাগায় তাহলে আশা করা যায় যে, তাদের ভুল ভাংবে, দ্বিধা দ্বন্দের অবসান ঘটবে । এ মেহনতের সহায়তায় জান-মাল কুরবানী করতে প্রস্তুত হবে।

তাবলীগী জামা‘আত এক শত বৎসর যাবৎ চালু হয়েছে - এ ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে- এটি কোন আপত্তির কিছু নয় । প্রচলিত দ্বীনী মাদ্রাসা এবং তার নিয়ম-পদ্ধতি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় ছিল না। তাই বলে কি এটা বিদ‘আত বা নাজায়িজ হবে? কখনও নয়। কারন, মূল তা’লীম তো হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় ছিল। তেমনিভাবে দীনের দা’ওয়াতের কাজও নি:সন্দেহে নবী (সা:)-এর যমানায় চালু ছিল। এ সমস্ত কটুক্তিকারীদের

উচিৎ, আম্বিয়া (আ:) ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনী পড়া। তাহলে তারা জানতে পারবে তারা কি ঘরে বসেই দীনের দা'ওয়াত দিয়েছেন, নাকি মানুষের দুয়ারে গিয়ে দীনের দা'ওয়াত পৌছিয়েছেন? [প্রমাণ ফাতওয়া মাহমুদিয়া,১:৪১৮-৪৬৫]

**প্রশ্নঃ -১১ :** তাবলীগ করা উম্মতে মুহাম্মদীর উপর কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

**উত্তরঃ** সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ আখেরী উম্মতের উপর গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব। বরং এই দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে এ উম্মতকে সবোর্ত্তম উম্মত বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। নিজের পরিবার পরিজন তথা যতটুকুর মধ্যে প্রত্যেকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে, ততটুকুর মধ্যে এই দায়িত্ব ফরজে আইন ও একান্ত কর্তব্য। সমগ্র মুসলিম জাতীর সংশোধনের জন্য ও বিশ্বের কোটি কোটি অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক ময়দানে সহীহ ভাবে মেহনত করা ফরজে কেফায়া। তবে তাবলীগ জামা'আতের সাথে জামা'আতের নাম করা জরুরী নয়। এ নাম তো হযরত মাওলানা ইলিয়াস ( রাঃ) দেননি। অবশ্য তার সময় থেকে লোকদের মুখে মুখে এ

নাম চলে আসছে। মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এর যামানার আগে বিভিন্ন নামে দীনের কাজ চালু ছিল। এখনও তাবলীগ জামা'আত ছাড়াও বিভিন্ন নামে সহীহ মেহনত চালু আছে।

মোদ্দা কথা , সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এটাই হলো মূল কাজ। এখন তা যে নামেই করা হোক না কেন, তবে তাবলীগের নামে যে কাজ চলছে, তা নিঃসন্দেহে সহীহ মেহনত এবং এর দ্বারা হাজার হাজার লোক সঠিক পথের দীশা পাচ্ছে। এ জন্য তাবলীগী জামা'আতকে সমগ্র বিশ্বের হাক্কানী উলামাগণ সহীহ মেহনত বলে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান যমানার সাধারণ মুসলমানদের দীন ঈমান সহীহ করার জন্য তাবলীগী মেহনত সবচেয়ে সহজ পদ্বতি। সুতরাং এর সমালোচনা করা নির্বুদ্ধিতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি ইসলাম ও তাবলীগী জামা'আত সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না , তিনি বিশোদগার করেন। সময় লাগালে তিনি অবশ্যই এ কথা থেকে তওবা করে নিবেন বলে মনে করি।

**সমাপ্ত**